প্রথম আলো

তারিখ ... 18 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ২০ ... ৪

উচ্চশিক্ষা ■ ফজলুল হক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ঢেলে সাজানোর চিন্তা

সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকেই দেশের বৃহত্তম এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্বিনীতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে। অতিসম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কীভাবে দেশের অন্য ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বণ্টন করা যায়, তার প্রক্রিয়া নির্ধারণের প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য এ কমিটি গঠন। গত ৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি প্রথম সভাও সম্পন্ন করে। বিস্ময়ের ব্যাপার, বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং করণীয় বিবেচনায় না নিয়ে সরাসরি এর কাঠামো পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

কমিটির পরিকল্পনায়ও রয়েছে স্ববিরোধী চিন্তাধারা। যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজ রাখা হবে তার তালিকা তৈরি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে করণীয় নির্ধারণ। যদি বিভাগীয় পর্যায়ের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের কলেজগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পাবে! আর এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নতুন করে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র কিংবা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর জন্য করণীয় তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। কেননা বর্তমানে এখানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জার্নাল প্রকাশ এবং এমফিল ও পিএইচডি কর্মসূচি চালু আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান আইন অনুযায়ীই গাজীপুর ক্যাম্পাসে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার সুযোগ রয়েছে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা ৪১-এ পাঠক্রমে ভর্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, 'এই আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে স্নাতকপূর্ব, স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পাঠক্রমে ছাত্র ভর্তি একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত ভর্তি কমিটি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে।' কাজেই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত চলমান চিন্তা ও কর্ম-প্রক্রিয়ায় বাস্তবতার দিকটি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে গৃহীত ৩৭ নম্বর আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের সব কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করার প্রয়োজনে। তখন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম) পরিচালিত হতো কলেজগুলোর একাডেমিক কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল ক্যাম্পাস এবং অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার পরিবেশ, অবকাঠামোগত বৈসাদৃশ্য, উপকরণগত পার্থক্য, শিক্ষকদের একাডেমিক যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা-পদমর্যাদার অসমতা ইত্যাদি কারণে যেমন শিক্ষার সমমান প্রশ্নবিদ্ধ ছিল, অন্যদিকে ছিল বিপুল সেশনজট। এই উভয়বিধ অসুবিধা থেকে জাতিকে মুক্তি দেওয়ার মহান লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। আইনটির ধারা ৪-এ বর্ণিত আছে, 'এতদিয়ার—বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোন কৃষি, চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইনের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।' আবার, ধারা ৫ জানাচ্ছে, 'এই আইনের বিধান অনুযায়ী গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, উহার বিবেচনায় উপযুক্ত, বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র বা ক্যাম্পাস স্থাপন করিতে পারিবে।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক কেন্দ্র বা ক্যাম্পাস স্থাপন করার সুযোগ থাকতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা নেওয়ার কী প্রয়োজন পড়ল? আর ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজ নিজ সমস্যায় এখনো ভারাক্রান্ত; অস্থিরতা এবং সেশনজট যেন স্থায়ী অনুষঙ্গ। এ ছাড়া সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক) হওয়ায় কলেজগুলোর সাধারণ শিক্ষা (কলা বা মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রশাসন) তত্ত্বাবধানে নতুন ও অপ্রত্যাশিত সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

কলেজ শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা সমীচীন ও প্রয়োজন'—এই আলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও, অজানা কী কারণে, ঢাকার দুটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, একটি লেদার টেকনোলজি কলেজ এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়ে গেল, তা আমরা ভেবে দেখিনি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি কথা খুব প্রচলিত হয়ে গেছে, তা হলো—প্রতিষ্ঠানটি নাকি একটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মতো শুধু পরীক্ষা নেওয়া আর সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ করছে। তথ্য না জেনে যাঁরা ঢালাওভাবে এ ধরনের ক্ষোভ-উদ্দীপক মন্তব্য করেন, তাঁরা বোধ হয় বিবেচনা করেন না এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিধি এবং চলমান কর্মকাণ্ডগুলো। কোনো শিক্ষা বোর্ড নিশ্চয়ই শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জার্নাল প্রকাশ এবং এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও একাডেমিক দায়িত্ব পালন করে না, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করে।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে কোনোভাবে প্রভাবিত কিংবা আবেগতাড়িত না হয়ে সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দেশের প্রায় এক হাজার ৮০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদসৃষ্টি-নিয়োগ (সম্ভাব্য সৃষ্টপদে শিক্ষকদের যোগ্যতা-কাঠামো পুনর্গঠনসহ), অবকাঠামো ও উপকরণসুবিধার উন্নয়ন ছাড়া কোনোভাবেই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; তা অন্য যেকোনো বা যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কেই দায়িত্ব দেওয়া হোক না কেন। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে বিপুল ভার গ্রহণ করতে বাধ্য না করে বরং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগুলোকে (সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল প্রভৃতি) সঠিকভাবে সাজানো (প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে) প্রয়োজন। উল্লেখ্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৮ জন শিক্ষক থাকলেও কোনো অধ্যাপক নেই অথচ সিনেট-সিন্ডিকেট-একাডেমিক কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সদস্যপদ রয়েছে। প্রয়োজনে কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র বা ক্যাম্পাস নির্মাণ করে এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। আর কলেজগুলোতে প্রতিবছর অস্বাভাবিকভাবে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি না করে বিভাগীয় পর্যায়ে আলাদা আলাদা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও ভেবে দেখা যায়।

আমরা নিনবদলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। কিন্তু বদল মানে পেছনে ফিরে যাওয়া নয়, বরং অগ্রসর-প্রবণতাকে আত্মস্থ করে সামনের দিকে ধাবমান হওয়া। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনাগুলো পুনর্বিবেচনা করে (প্রয়োজনে কমিটি পুনর্গঠন করে) প্রতিষ্ঠানটির চলমান অবস্থা পর্যালোচনা ও বিবেচনায় রেখে এর অগ্রগতির কৌশল নির্ধারণ সমীচীন হবে বলে মনে করি।

● ড. ফজলুল হক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
snuc90@yahoo.com